শয়তানের জবানবন্দি (পর্ব -২)

--আরজ আলী মাতুব্বর

[আরজ আলী মাতুব্বর (জন্ম - ৩ পৌষ ১৩০৭ এবং মৃত্যু- ১ চৈত্র ১৩৯২) বাঙলাদেশের একজন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। একাধারে তিনি একজন মৌলিক চিন্তাবিদ, দার্শনিক, যুক্তিবাদী, তিনি বিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞানের সত্যের পূঁজারী। তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও, তিনি আমাদের কুসংস্কারচ্ছন্ন উপাসনাধর্মের নামে প্রচলিত 'সত্য' সম্পর্কে সত্যসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁর মূল জিজ্ঞাসা হয়ে দাড়ায় উপাসনাধর্মের নামে 'কুসংস্কার সত্য', না 'বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান সত্য'? এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে আরজ আলী বিপুলভাবে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। আর এই অধিত জ্ঞান তিনি ব্যক্ত করেন তাঁর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে। যে গ্রন্থগুলি মুক্তবুদ্ধিরচর্চাকারী, যুক্তিপ্রবণ পাঠকের অবশ্যই পাঠ্য, সত্যসন্ধানীদের প্রেরণা। গ্রন্থগুলির মাধ্যেম তিনি আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এক কাঠকোট্টা বাস্তবের মুখোমুখি; ভ্রান্ত জ্ঞান আর কুসংস্কারে ভরপুর উপাসনাধর্মগুলিকে তিনি বিশ্লেষন করেছেন নির্মোহভাবে, যুক্তিবাদী মানসিকতায়। ছুঁড়ে দিয়েছেন প্রশ্ন আমাদের দিকে, আর কতকাল চলবে উপাসনাধর্ম নামের বিষফোঁড়াকে নিয়ে আমাদের ভন্ডামি?? এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও উত্তরটা বড়ই কঠিন। তবু আশায় বাধি বুক, অন্ধদের আস্ফালন প্রতিরোধ করতে, আঁধারের দুবৃত্তদের পরাস্ত করতে আরজ আলীর দর্শন আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে; কাজ করবে বিজ্ঞানমনস্ক মুক্তচিন্তায় সাবলীল হতে। সত্যের অনুসন্ধানে অনুবর্তী হতে আমাদেরকে সমর্পিত হতে হবে আরজ আলীর কাছে। এ দূঃসময়ে আমাদের আরজের প্রয়োজন বড় বেশী। তাই আরজ আলীর মাতুব্বরের চর্চা হওয়া প্রয়োজন মাত্রাতিরিক্ত মাত্রায়। ধন্যবাদ।

পূর্ববর্তী অংশের পর.......

''বলা হয় যে, আমি অভিশপ্ত, তিরস্কৃত ও নির্বাসিত হয়েছি। বাস্তবে তার একটিও না। এ বিষয়ে একটু খোলাসা করেই বলি।

‘‘প্রথমত আমি আল্লাহর বিরাগভাজন ও অভিশপ্ত হয়ে থাকলে তিনি আমাকে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান করতে পারতেন, পারতেন রোগ, শোক, দুঃখ-কষ্ট ও অভাব ভোগ করাতে, যেমন করেছেন হারুৎ-মারুৎ ফেরেস্তাদ্বয়কে। সর্বোপরি পারতেন মৃত্যু ঘটিয়ে জগত থেকে আমাকে নিশ্চিহ্ন করতে। কিন্তু তিনি তার একটিও করেননি। বরং উল্টোই করেছেন। যদি কেউ কাউকে বলে, ‘তুমি রোগ, শোক, দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করো’- তাহলে সেটা কি তার পক্ষে আশীর্বাদ না অভিশাপ? আল্লাহ আমাকে কোনো রোগ দেননি, শোক দেননি, অপমৃত্যু দেননি, কোনো অভাব দেননি, বরং দীর্ঘায়ু দান করেছেন। এসবের মধ্যে অভিশাপ কোনটি?

‘‘দ্বিতীয়ত বলা হয়ে থাকে যে, আমি তিরস্কৃত হয়েছি। অর্থাৎ আল্লাহ আমার কণ্ঠে লা’নতের তাওক দান করেছেন। এ কথাটিও পুরো ঠিক নয়। আমি ‘তাওক’ একটি পেয়েছি ঠিকই। তবে সেটা কাঠের না লোহার না স্বর্ণের তৈরী, কেউ তা দেখননি বা শোনেননি কারো কাছে আজ পর্যন্ত। ওটা কারাবাসীর কণ্ঠে যেমন তিরস্কার (তাওক), তেমনি বিজয়ীর কণ্ঠে পুরস্কার (মেডেল) সূচিত করে। তারতম্য শুধু গঠন ও উপকরণে। এ বিষয়ে পরে বলবো।

‘‘তৃতীয়ত বলা হয় যে, আমি বেহেস্ত থেকে বিতাড়িত হয়েছি, নির্বাসিত হয়েছি পৃথিবীতে। আল্লাহর আদেশে পৃথিবীতে আসা-যাওয়া অথবা স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাঁর নির্দেশিত কর্তব্য তো অন্যান্য ফেরেস্তাগণও পালন করে থাকে। তারাও কি নির্বাসিত? জেবরাইল ফেরেস্তা সংবাদ বহন ও আজরাইল ফেরেস্তা মানুষের জান কবজ করার উদ্দেশ্যে না হয় পৃথিবীতে আসে ও চলে যায়। কিন্তু মিকাইল ফেরেস্তা পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারে না আবহাওয়া বিভাগের কাজ বন্ধ করে। কেরামান ও কাতেবীন ফেরেস্তাদ্বয় রোজনামচা (ডাইরী) লেখা ছেড়ে দিয়ে মানুষের কাঁধ থেকে এক পা বাইরেই দিতে পারে না এবং মনকির ও নকিরকে তো জীবন কাটাতে হচ্ছে মানুষের কবরে কবরেই পৃথিবীতে। এঁরা যদি নির্বাসিত বলে সাব্যস্ত না হন, তবে আমি নির্বাসিত হই কোন বিচারে? আমিও তো আল্লাহর আদেশে আমার কর্তব্য পালন করে যাচ্ছি পৃথিবীতে বসে। বরঞ্চ আমি ওদের প্রত্যেকের চেয়ে মুক্ত স্বাধীন।

‘‘জেবরাইল ফেরেস্তা সংবাদবাহক। সে আল্লাহর সকালের আদেশ কারো কাছে বিকালে পৌঁছাতে পারে না। মেকাইল ফেরেস্তা আবহাওয়া পরিচালক ও খাদ্য পরিবেশক। সে আল্লাহর সকালের আদেশের বৃষ্টি বিকেলে এবং বাংলাদেশের বৃষ্টি আরবদেশে বর্ষাতে পারে না, পারে না ধনীর খাদ্য গরীবকে দান করতে। এভাবে প্রত্যেক ফেরেস্তাই আছে তাদের নিজ নিজ কর্তব্যের নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু আমার কর্তব্য (পরীক্ষা) কাজ সম্পাদনে আল্লাহ আমাকে এরূপ কোনো নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেননি। আমার পরীক্ষাকাজের সকাল-বিকাল নেই বা শীত-বসন্ত নেই, এশিয়া-ইউরোপ নেই; নেই যুবা-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব পার্থক্যের নির্দেশ। বস্তুত আমি বিতাড়িত বা নির্বাসিত নই, অন্যান্য ফেরেস্তাদের মতোই আমি কর্তব্যের খাতিরে প্রেরিত হয়েছি পৃথিবীতে। আমি আল্লাহর মনোনীত ফেরেস্তা- বিশ্ববাসীর বিশ্বাসের পরীক্ষক (একজামিনার)।

‘‘বলা হয় যে, আদমকে সেজদা না করায় আমি ঘৃণিত ও অধঃপতিত হয়েছি এবং আদমকে গন্দম ভোজন করিয়ে মানুষের শত্রু হয়েছি। বাস্তবে তা নয়। বরং পুরস্কৃত হয়েছি ও পদোন্নতি লাভ করেছি এবং মানবকুলের বন্ধুর কাজই করেছি। আমার কথা শুনে আপনি একটু তাজ্জব হলেন বুঝি। এ বিষয়ে একটু বুঝিয়ে বলি।

‘‘ফেরেস্তারা নূরের তৈরী। তাই পাক-সাফ বটে, তবে ওদের বুদ্ধি নেহাত কম। নিজেরা কোনো কাজই করতে পারে না আল্লাহর হুকুম তামিল করা ছাড়া। ‘হাঁ হুজুর’ ছাড়া ‘না হুজুর’ বলার ওদের অভ্যাস নেই। তবে একদিন ‘না হুজুর’ বলেছিলো, কিন্তু তা খাটেনি। আল্লাহ পৃথিবীতে মানবজাতি সৃষ্টির পরিকল্পনা ঠিক করে আদমকে বানাবার পূর্বে ফেরেস্তাগণের আক্কেল পরীক্ষা

করার উদ্দেশ্যে তাদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। তাতে তারা আল্লাহকে বলেছিলেন, 'আদমীরা আপনার হুকুম-আহ্‌কাম মানবে না বা এবাদত করবে না। সুতরাং আদম সৃষ্টি না করাই উত্তম।' মানবজাতির পরম সৌভাগ্য যে, আল্লাহ ফেরেস্তাদের সে উপদেশ অগ্রাহ্য করে আদমকে বানালেন। কিন্তু আল্লাহ যদি ফেরেস্তাদের প্রস্তাব মেনে আদমকে না বানাতেন, তাহলে মানবজাতির এ দুনিয়াপ্রতীর কি দশা হতো?

''আদমকে বানিয়ে আল্লাহ ফেরেস্তাদের ডেকে বললেন - তোমরা আদমকে সেজদা করো। আল্লাহর হুকুম পেয়ে সব ফেরেস্তা একযোগে অর্থাৎ জামাতের সহিত এক রাকাত নামাজ আদায় করলেন আদমকে কেবলা করে। কিন্তু আমি সে নামাজ পড়লাম না। আল্লাহর আসনে আদমকে বসিয়ে তাকে সেজদা করতে আমার বিবেক বাধা দিলো। আমার বিবেক বললো যে, **আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, 'আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা কোরো না।' তবে আজ কেন আদমকে সেজদা করতে বললেন? হয়তো এর কারণ ফেরেস্তাদের আক্কেল পরীক্ষা করা।** আল্লাহ দেখতে চান যে, ওদের তুচ্ছ করা আদমকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ফেরেস্তারা সেজদা করতে আপত্তি করে কি-না।

''মনে করুন - কোনো এক ব্যক্তি তার পাঁচটি ছেলেকে ডেকে জৈনক পথিককে দেখিয়ে বললো, 'তোমরা সবাই ওকে বাবা বলে ডাকো'। পিতার আদেশ পালন করা কর্তব্য, এ নীতিবাক্যটি পালন করে চারটি ছেলেই সেই পথিককে 'বাবা' বলে ডাকলো। কিন্তু একটি ছেলে ডাকলো না। সে ভাবলো, ''পিতা কখনো দু'জন হতে পারে না। পথিককে বাবা বললে তা হবে মিথ্যে কথা বলা। আর পিতা তো আগেই বলেছেন, কখনো মিথ্যে কথা বলবে না। আমার মুখে পথিককে বাবা ডাকার মধুর শব্দটি শুনে পিতা খুশী হবার জন্য নিশ্চয়ই এ কথাটি বলেন নি, বলেছেন আমাদের আক্কেল পরীক্ষা করার জন্য। সুতরাং পিতার এ আদেশটি না মানাই শ্রেয়।' এ ভেবে সে ছেলেটি তার জীবনের মহাকর্তব্য (সত্যকথন) পালন করলো, কপট পিতাকে মিথ্যা 'বাবা' ডাকলো না। ছেলেদের পিতা তাঁর চার ছেলের অজ্ঞতা দেখে মনোক্ষুন্ন হলেন এবং এক ছেলেকে বিজ্ঞতার পুরস্কার বাবদ তার গলায় দিলেন মেডেল।

''আল্লাহ হলেন অন্তর্যামী। মানুষ বা ফেরেস্তা কারো বাহ্যিক আচার-আচরণ দেখে তিনি তুষ্ট হন না, বিচার করেন মনের। আদমকে সেজদা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ ফেরেস্তাগণের আক্কেলের পরীক্ষা নিয়েছিলেন। আমি তাতে উত্তীর্ণ হওয়ায় তিনি আমাকে দান করেছেন বিজয়ের একটি নিশানা। কেউ কেউ তাকে বলে আমার পরাজয়ের নিশানা বা লা'নতের তাওক। বস্তুত আল্লাহ আমাকে দান করেছেন বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ 'মেডেল'।

''বলা হয় যে, আমি আদমের শত্রু, আদম জাতির শত্রু। কেন না গন্দম ভক্ষণ করিয়ে আমি আদমকে বেহেস্তছাড়া করেছি। আসলে তা নয়। যৌনক্রিয়ায় নাকি মানুষ নাপাক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বেহেস্ত হলো চির পবিত্র স্থান। সেখানে ওসব নাপাকীর কোনো স্থান নেই। কাজেই আদম-হাওয়া বেহেস্ত থাকলে তাদে যৌনক্রিয়া আজীবন বন্ধ রাখতে হতো। ফলে আদম থাকতেন নিঃসন্তান ও নির্বংশ। আদমের প্রেমাসক্তি সম্পূরণ ও বংশবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ আদম-হাওয়াকে স্থান দিয়েছেন পৃথিবীতে তাদের বংশবৃদ্ধির গরজে।

''বেহেস্তের মধ্যে তখন তিন জাতীয় ফলের গাছ ছিলো। প্রথমত সুখাদ্যদায়ক বৃক্ষ, এর ফলগুলো ছিলো সাধারণ খাদ্য। অর্থাৎ জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য। দ্বিতীয়ত জীবন বৃক্ষ। এর ফলগুলি ছিল অমরত্বের প্রতীক। অর্থাৎ পরমায়ুবর্ধক। তৃতীয়ত জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ। অর্থাৎ জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক। এই 'জ্ঞানদায়ক' ফলটিরই নামান্তর 'গন্দম'।

''আদমকে যখন বানানো হলো, তখন তিনি ছিলেন নির্জীব মাটির পুতুল এবং আল্লাহ যখন প্রাণদান করলেন, তখন হলেন তিনি সজীব পুতুল। কিন্তু তখনও 'জ্ঞান' বস্তুটি তার মধ্যে ছিলো

না মোটেই। এমন কি লজ্জা-জ্ঞানও না। আদম-হাওয়া ছিলেন উলঙ্গা। ইতর প্রাণী ও মানুষের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো লজ্জাজ্ঞান। আদম-হাওয়ার সেই লজ্জাজ্ঞান জন্মালো গন্ধম ভক্ষণের পর। ক্রমে জন্মালো ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিবিধ জ্ঞান গন্ধম ভক্ষণের ফলে। পক্ষান্তরে বিবি হাওয়া হলেন রজস্বলা গন্ধম ছেঁড়ার ফলে। কাজেই গন্ধম না খেলে হযরত আদম থাকতেন জ্ঞানশূণ্য আর বিবি হাওয়া থাকতেন বন্ধ্যা। আদমের জ্ঞান আর বিবি হাওয়ার সন্তানোৎপাদিকা শক্তি জন্মালো গন্ধম খাওয়ার ফলে। সুতরাং গন্ধম খাইয়ে আমি শুধু আদম-হাওয়ারই নয়, তাবৎ মানবজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বংশবিস্তারের সহায়তাই করেছি, যা অন্য কোনো ফেরেস্তা করেননি। কার্যত আমি মানুষের পিতার চেয়ে ভক্তির পাত্র এবং গুরুর চেয়ে মান্যবর। দুঃখের বিষয় এই যে, কতক মানুষ তা বাহ্যত মানতে চান না, তবে কার্যত মেনে চলেন। আর তাতেই আমি সন্তুষ্ট। কেননা **একজন বিশ্বাসী মানুষ দিনেরাতে নানা কারণে যতবার আমার নামটি মুখে উচ্চারণ করেন, মনে হয় যে, ততোবার তার বাবার নামও উচ্চারণ করেন না। বিশেষত আমার নামটি তাদের প্রাতঃস্মরণীয় ও অগ্রপাঠ্য।**

‘‘আপনি ভাবছেন, এ বিরাট পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে দাগা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় কিরূপে। আপনার এ ভাবনাটা অমূলক নয়। আসলে এ কাজটা ততো কঠিন নয় আমার পক্ষে। কেননা আমি দুনিয়ার সকল অঞ্চলের সকল মানুষকে দাগা দেই না, দাগা দেই ঈমানদারদিগকে। অর্থাৎ যারা আমাকে বিশ্বাস করে তাদেরকে। আমার উপর যাদের ঈমান নেই, অর্থাৎ আমি ‘আছি’ বা আমার অস্তিত্বকে যারা অস্বীকার করেন, তারা তো কাফের। কেননা পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলেছেন, ‘শয়তান আছে’ এবং পবিত্র হাদিসে নবী বলেছেন, ‘শয়তান আছে’। এতদসত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি যদি বলে, ‘শয়তান নেই, তবে পবিত্র কোরান-হাদিসের বাণী অমান্যকারী সে ব্যক্তি কি কাফের নয়?

‘‘আবার যে ব্যক্তি কাফেরের ঔরসে জন্মলাভ করে, সে তো জন্মসূত্রেই কাফের এবং সে নানাবিধ বেসরা কাজ (মূর্তিপূজা) ইত্যাদি করে থাকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আমার দাগা দেওয়া ছাড়াই। তাকে তার কৃতকর্মে বাধা দানের অর্থ হয় অসৎকাজে অর্থাৎ পাপকাজে বাধাদান করা। আল্লাহ তো কারো অসৎকাজে আমাকে বাধা দিতে বলেন নি। তাই আল্লাহর আদেশ মেনেই আমি কারো দাগা দেই না। অর্থাৎ আমার অস্তিত্বের উপর যাদের ঈমান নেই, তাদের আমি দাগা দেই না এমনকি তাদের কোনো সৎকাজেও না। তাইতো **বর্তমান দুনিয়ায় ঈমানদারের চেয়ে বেঈমানদারগণই সৎকাজ করেন বেশী।**

‘‘আমাকে যেমন সকল মানুষকে দাগা দিতে হয় না, তেমন সকল জায়গায় আমি সমভাবে অবস্থানও করি না। **বিশ্বাসীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, উপাসনা মন্দির ও ধর্মধামেই আমাকে সময় কাটাতে হয় বেশী। কেননা ওগুলোই হচ্ছে আমার প্রধান কর্মকেন্দ্র।** তবে মফস্বলেও কিছু কিছু কাজ না করলে চলে না।

‘‘আপনার জানতে ইচ্ছা হচ্ছে যে, অহরহ মানুষের সহবাসে থাকা সত্ত্বেও তারা আমাকে দেখতে বা আমার অস্তিত্বই অনুভব করতে পারে না, এর কারণ কি এবং কোথায় বসে আমি দাগা দিয়ে থাকি? তা বলি শুনুন।

‘‘আল্লাহ আমাকে ক্ষমতা দান করেছেন মানুষের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে এবং শিরায় শিরায় চলতে। যখন আমি কোনো ব্যক্তিকে দাগা দিতে চাই, তখন তাকে বাইরে থেকে ডেকে বলি না যে, তুমি এ কাজটি করো না এবং ও কাজটি করো। আমি তখন প্রবেশ করি তার দেহের কেন্দ্রস্থল মস্তিষ্কে এবং মস্তিষ্কের কেন্দ্রবিন্দু ত্রিতলা মনের একেবারে নীচের তলায়, যে জায়গাটির নাম ‘অচেতন মনে’ বা ‘নির্জ্ঞান মন’। সেখানে বসে আমি তার ‘অচেতন মন’কে প্রলুব্ধ করি কোনো কাজ করতে বা না করতে। আমার কর্মকেন্দ্র মানুষের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে অবস্থিত। তাই দুষ্ট

লোকেরা বলে ‘টুপির নীচে শয়তান থাকে’। তাদের সে কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। কেননা আমার অধিষ্ঠানটি টুপির নীচেই, উপরে নয়।

‘‘আমি পূর্বেই বলেছি যে, আমি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারি না, কেউ পারে না। আমি যা কিছু করি তদ্দারা আল্লাহর ইচ্ছাকেই পূরণ করি এবং অন্যেরাও তা-ই করে থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে, বিশ্বাসীরা তা পুরাপুরি মানেন না। তাঁরা আল্লাহকে বলেন সর্বশক্তিমান, আবার কোনো কাজে আমার উপর দোষ চাপান। শুধু তাই নয়, তাঁরা আরোও বলেন, **‘শুভ কাজের কর্তা আল্লাহতা’লা এবং অশুভ কাজের কর্তা শয়তান।’ যদি তা-ই হয়, তবে ‘আল্লাহ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সর্বশক্তিমান’- এ কথাটির সার্থকতা কি?** এতে কি আমাকে ‘আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ও দ্বিতীয় শক্তিধর’ বলে প্রমাণিত হয় না? বস্তুত তা নয়। আমার সমস্ত কাজেই আছে আল্লাহতা’লার সমর্থন। এখন তাই একটু বলছি।

‘‘বলা হয়, আল্লাহ দুনিয়ার সব কাজ করবার ক্ষমতাই মানুষকে দান করেছেন। কিন্তু হায়াত, মউত, রেজেক ও দৌলত, এ চারটি কাজ রেখেছেন নিজের হাতে। আবার এ কথাও বলা হয় যে, খুন-খারাবী, চুরি-ডাকাতি ও ব্যভিচারের উদ্যোক্তা শয়তান। তাই যদি হয় অর্থাৎ আমার দাগায় পড়েই যদি কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে আহত ব্যক্তির জান কবজ করতে আজরাইল ফেরেস্তা সেখানে আসেন কার হুকুমে? সেই দিনটি মৃতব্যক্তির হায়াতের শেষ দিন নয় কি? কলেরা-বসন্তাদি রোগে অসংখ্য মানুষ মরে জীবানুর আক্রমনে। সেই জীবানুদের দাগা দেয় কে?

‘‘সমস্ত জীবের রেজেক (খাদ্য) দান করেন স্বয়ং আল্লাহতা’লা। চোর -ডাকাতের রেজেক দান করেন কে? মানুষ জানে না যে, আল্লাহ কার রেজেক কার ভান্ডারে রেখেছেন। আল্লাহ যার রেজেক ও দৌলত যেখানে রেখেছেন, যে কোনও উপায়েই হোক সেখান থেকে এনে সে তা ভোগ করবেই। চোর চুরি করে বটে, কিন্তু আসলে সে তার আল্লাহর বরাদ্দকৃত খাদ্যই পায়। আমি যদি দাগা দিয়ে চুরি-ডাকাতির মাধ্যেমে একের রেজেক অন্যকে খাওয়াতে পারি, তাতে আল্লাহর গৌরব বাড়ে কি? অন্যান্য জীবের রেজেকও আল্লাহতা’লাই জোগান। গেরস্ত বাড়ির হাঁস-মোরগ ও খাদ্যাদি চুরি করে শেয়াল-কুকুর খায়। তাদের দাগা দেয় কে?

‘‘বলা হয় যে, শয়তানের খপ্পরে পড়ে মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাতে আল্লাহর কোনো সমর্থন নেই। তাই যদি হয় তবে জারজ সন্তানের প্রাণদান করে কে? মানব সৃষ্টোত্তর কালে আল্লাহ যখন মানুষের প্রাণ সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই তিই জানেন যে, কোন্ প্রাণ কখন কোথায় জন্মাবে, কে কি কাজ করবে এবং অন্তিমে কে কোথায় যাবে, অর্থাৎ বেহেস্ত না দোজখে। তিনি এ-ও জানতেন যে, কে কার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। তিনি ইচ্ছে করলে ব্যভিচারীদ্বয়কে দাম্পত্যবন্ধন দান করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে জারজ সন্তানদের জন্য প্রাণ সৃষ্টি করে রেখেছেন। জারজ সন্তানদের প্রাণদান করেন আল্লাহ ইচ্ছা করেই। ব্যভিচার ঘটিয়ে আমি আল্লাহর সেই ইচ্ছাকেই পূরণ করি মাত্র।

‘‘বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, শয়তান না থাকলে মানবজাতির মঙ্গল হতো। তাঁরা ভেবে দেখননি, আমার নির্দেশিত পথে চলেই বর্তমান জগতের মানুষের যতো সব আয়-উন্নতি এবং তারই সাহায্যে চলছে ভালো ধর্মের বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য। আজ যদি আমি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাই বা আমার দাগাকাজ বন্ধ করি, তাহলে মানবসমাজে যে বিপর্যয় দেখা দেবে তা থেকে রক্ষা পাবে না বিশ্বাসীরাও।

‘‘প্রথমত কতিপয় রাষ্ট্রীয় দপ্তর থাকবে না। ফলে মন্ত্রিত্ব হারাবে অনেকে এবং রাজ্যশাসনে বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ হবে কর্মহীন। সুরশিল্পী, চিত্রশিল্পী থাকবে না, থাকবে না মাদকদ্রব্যের ব্যবসা। এছাড়া থাকবে না সুদ, ঘুষ, কালোবাজারী ইত্যাদির পেশা। আর এতে মানবসমাজে যে

ভয়াবহ বেকারত্ব ও আর্থিক সংকট দেখা দেবে, তার প্রতিক্রিয়া হবে ধর্মরাজ্যেও। কেননা **ঐসব অসৎবৃত্তির আয় দ্বারাই তো হচ্ছে যতো মসজিদ-মাদ্রাসার ছড়াছড়ি ও হজ্জ্বযাত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধি।**

‘‘কোন কিছুর অভাব আমার নেই বা অন্য কোনো দুঃখ আমার নেই। একটি মাত্র দুঃখ এই যে, মানুষ আল্লাহকে না জানার ফলে এবং তাঁর কুদরৎ অনুধাবন করতে না পেরে অযথা আমার উপর দোষারোপ করে। আল্লাহ ইচ্ছাময় ও সুমহান।

‘‘এখন আর বেশী কথা বলার সময় নেই। নামাজের সময় হচ্ছে, মসজিদে যাই। আসসালামু আলাইকুম।’’

আগন্তুক চলে গেলেন মসজিদের দিকে। কিন্তু নামাজ পড়তে না দাগা দিতে তা বুঝা গেল না। মাইকের আজানে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো, চেয়ে দেখি পূর্ব আকাশ পরিষ্কার।

বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে আমি ভাবতে লাগলাম - এতদিন আমার মনে হচ্ছিল যে, হিন্দু পুরাণশাস্ত্রে লিখিত ‘নারদ মুনি’ই পরবর্তীকালে ‘শয়তান’ রূপ লাভ করেছে। উভয়ের পরিচয়পত্র মিলালে তা বেশ বুঝা যায়। হিন্দুশাস্ত্রমতে - ‘নারদ’-এর মাতাপিতা নেই। সে ভগবান ব্রহ্মার মানসসৃষ্টি। তার বাসস্থান ছিল স্বর্গে এবং সে ছিলো ধার্মিক চূড়ামনি। সে সৃষ্টিকর্তার একটি আদেশ অমান্য করায় অভিশপ্ত হয়ে (মানবরূপে) পতিত হয় মর্ত্যে (পৃথিবীতে)। সে ছিলো সর্ববিদ্যাবিশারদ এবং স্বর্গ-মর্ত্য-অন্তরীক্ষে ছিলো তার অবাধ গতি (১)।

সৃষ্টি, বাসস্থান, স্বর্গচ্যুতি ও গুনাবলী বর্ননায় ‘নারদ’ এবং ‘শয়তান’ - এ দুজনের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। শয়তান যেন নারদের একটি অভিনব সংস্করন। তবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় নয়, চতুর্থ সংস্করন। নারদ-নাটকের দ্বিতীয় সংস্করনের নায়ক পার্সি ধর্মের ‘আহরিমান’, তৃতীয় সংস্করনে ইহুদী ধর্মের ‘সেদিম’ বা ‘দেয়াবল’ এবং চতুর্থ সংস্করনের নায়ক হচ্ছে শেষ জামানার ‘শয়তান’।

পূর্বেকার ঐসব ‘অনুমান’ আমার হঠাৎ যেনো নস্যাৎ হয়ে গেলো। কেননা মূর্তিমান শয়তান যে আজ আমার চোখের সামনেই বসা ছিল এতক্ষণ।

--সমাপ্ত--

(১) সরল বাঙ্গালা অভিধান, সুবলচন্দ্র মিত্র, পৃ- ৪৫৩।

অনুলিখনে :- অনন্ত

তারিখ :- ১৩-০২-০৬

ইমেইল :- ananta_atheist@yahoo.com

[আলোচ্য গল্পটি ‘**আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১; সম্পাদনা- আইয়ুব হোসেন; প্রকাশক : পাঠক সমাবেশ, ঢাকা-১০০০**।’ থেকে সম্পাদক আইয়ুব হোসেনের ব্যক্তিগত অনুমতি নিয়ে অনুলিখিত।